

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

প্রাথমিক বিজ্ঞান

পঞ্চম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. আলী আসগর

ড. মোঃ আনোয়ারুল হক

কাজী আফরোজ জাহানআরা

মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

প্রথম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১৫

পুনর্মুদ্রণ: জুলাই ২০২৩

পরিমার্জিত সংস্করণ: অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অস্তিত্বভিত্তিক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পথে যেন বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেতন রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুদের বিচিত্র কৌতুহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যেন একমুখী ও ক্রান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুভব হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুখম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কৃত্তিক দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে প্রাথমিক স্তরে 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুগুলো সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা, ছবি ও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বিশেষত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়াও পাঠ্যপুস্তকে বিজ্ঞান শিক্ষার মূল দুটি ধারাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যার একটি হলো তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞান অর্জন, অন্যটি হলো প্রশ্ন উত্থাপন, পরীক্ষণ, তথ্য ও তত্ত্বের শুদ্ধতা যাচাইয়ের ভিত্তর দিয়ে অংশগ্রহণ।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যারা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্য চিত্রকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকটিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে বেতে পারে। সুবিজ্ঞানের কাছ থেকে বৈজ্ঞিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্য সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

পরিমার্জিত প্রাথমিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. শিক্ষার্থী শিক্ষক বান্ধব

- শিক্ষার্থীর বৃষ্টির জল বিবেচনায় রেখে শিখনের বিষয়বস্তুর সচিত্র বর্ণনা ও উপস্থাপন করা হয়েছে এবং মুখস্থ করার পরিবর্তে শিক্ষার্থীর ধারণার বিকাশে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনপূর্বক নতুন পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে।
- শ্রেণি উপযোগী, সহজ ও সাবলীল ভাষায় পাঠের বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে।
- স্পষ্ট শিরোনাম, উপশিরোনাম ও পাঠ সংশ্লিষ্ট পর্যাপ্ত ছবি/চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।
- বিজ্ঞানের বিমূর্ত বিষয়সমূহকে চিত্র/ছবি এবং যথাযথ বর্ণনার মাধ্যমে সহজ সরল এবং বোধগম্য উপায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- পাঠ উপস্থাপনে কিছু ঐতীক/সংকেত ব্যবহার করে বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করা হয়েছে।
- শিখনের আশ্রয় সৃষ্টি ও চিন্তামূলক কাজে উৎসাহিত করার জন্য দুইটি চরিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।
- প্রতিটি অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট নতুন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রঙিন ও মোটা অক্ষরে লেখা হয়েছে।
- পাঠ্যপুস্তকের শেষে শব্দকোষ সংযুক্ত করা হয়েছে, যেখানে বিজ্ঞানের নতুন শব্দগুলোর সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

২. সমস্যা সমাধানভিত্তিক শিখনে গুরুত্ব প্রদান

- প্রতিটি পাঠ একটি মূল প্রশ্ন বা key question এর মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীদের জন্য অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ/ পরীক্ষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আলোচনামূলক কাজের সুযোগ রাখা হয়েছে। পাঠের শেষে তথ্যসমৃদ্ধ সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরীক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিকল্প উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু বিন্যাসে সমস্যা সমাধানভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে।
- বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে শিখন কার্যক্রমে সমস্যা সমাধানভিত্তিক বিভিন্ন প্রকার অনুশীলনের সুযোগ রাখা হয়েছে।

৩. পরিকল্পিত কাজ ও পরীক্ষণ

- শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং অনুসন্ধানমূলক কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা, প্রকাশ করার ক্ষমতা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের জন্য দলীয় আলোচনামূলক কাজের প্রবর্তন করা হয়েছে।
- স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১	আমাদের পরিবেশ	২-৮
অধ্যায় ২	পরিবেশ দূষণ	৯-১৪
অধ্যায় ৩	জীবনের জন্য পানি	১৫-২৪
অধ্যায় ৪	বায়ু	২৫-২৯
অধ্যায় ৫	শক্তি ও পদার্থ	৩০-৪০
অধ্যায় ৬	সুস্থ জীবনের জন্য খাদ্য	৪১-৪৬
অধ্যায় ৭	স্বাস্থ্যবিধি	৪৭-৫১
অধ্যায় ৮	মহাবিশ্ব	৫২-৬১
অধ্যায় ৯	আমাদের জীবনে প্রযুক্তি	৬২-৬৭
অধ্যায় ১০	আমাদের জীবনে তথ্য	৬৮-৭২
অধ্যায় ১১	আবহাওয়া ও জলবায়ু	৭৩-৮০
অধ্যায় ১২	জলবায়ু পরিবর্তন	৮১-৮৮
অধ্যায় ১৩	প্রাকৃতিক সম্পদ	৮৯-৯২
অধ্যায় ১৪	জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ শব্দকোষ	৯৩-৯৭ ৯৮-১০২

চরিত্র ও প্রতীক

১) চরিত্র



জুই দিপু

জুই এবং দিপু তোমার বিজ্ঞান শিখনে কিছু ইঙ্গিত অথবা ধারণা দেবে। এসো আমরা এক সঙ্গে বিজ্ঞান শিখি।

২) প্রতীক



কাজ : এসো আমরা পর্যবেক্ষণ করি, অনুসন্ধান করি এবং পরীক্ষা করে দেখি।



আলোচনা : চলো আমরা সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করি।



সাবধান হও : নিরাপদ থাকার জন্য চলো আমরা সতর্কতার সাথে কাজ করি।

আমাদের পরিবেশ

১. জীব ও জড় বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ক

পরিবেশের উপাদানগুলোকে আমরা জীব ও জড় এই দুই ভাগে ভাগ করি। মানুষ, পশু-পাখি, গাছপালা এরা হলো জীব। মাটি, পানি, বায়ু, গাড়ি, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি হলো জড়।



জীব ও জড় বস্তুর সম্পর্ক

প্রশ্ন : জীব কীভাবে জড়ের উপর নির্ভরশীল?



কাজ :

বৈচে থাকার জন্য জীবের যা প্রয়োজন

কী করতে হবে :

১. নিচে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

জীব	বৈচে থাকার জন্য যে জড় কত প্রয়োজন
মানুষ	
অন্যান্য প্রাণী	
উদ্ভিদ	

২. জীবের বৈচে থাকার জন্য যে সকল জড় কত প্রয়োজন তার একটি 'তালিকা তৈরি করি।
৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।



সূর্যের আলো ও বায়ু
জীব না জড় ?



খাদ্য তৈরির জন্য উদ্ভিদের
সূর্যের আলো, বাতাস ও
অন্যান্য জিনিস প্রয়োজন।

সারসংক্ষেপ

মানুষ

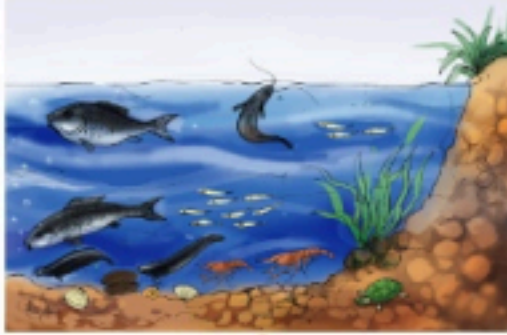
বেঁচে থাকার জন্য মানুষ বিভিন্ন জড় কতুর উপর নির্ভর করে। মানুষের শ্বাস গ্রহণের জন্য বায়ু এবং পান করার জন্য পানি প্রয়োজন। পুষ্টির জন্য খাবার প্রয়োজন। ফসল ফলানো ও বাসস্থান তৈরির জন্য মানুষের মাটি প্রয়োজন। এছাড়াও জীবন যাপনের জন্য বাসস্থান, আসবাবপত্র, পোশাক, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রয়োজন।



অন্যান্য প্রাণী

অন্যান্য প্রাণীও বেঁচে থাকার জন্য জড় কতুর উপর নির্ভরশীল। সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য বায়ু, পানি ও খাদ্য প্রয়োজন। মাটি এবং পানি অনেক জীবের বাসস্থান। অনেক পোকামাকড়, কেঁচো ইত্যাদি মাটিতে বাস করে। আবার মাছ, চিগুড়ি পানিতে বাস করে।

বেঁচে থাকার জন্য মানুষ জড়ের উপর নির্ভরশীল



পানির জীব



মাটির জীব

উদ্ভিদ

বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভিদ পরিবেশের বিভিন্ন জড় কতুর উপর নির্ভর করে। যেমন— মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদি। তাছাড়া সূর্যের আলোর উপরেও উদ্ভিদ নির্ভরশীল। উদ্ভিদ সূর্যের আলো, পানি ও বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে নিজেদের খাদ্য নিজেই তৈরি করে। পানি আবার বিভিন্ন উদ্ভিদের আবাসস্থল। যেমন— শাপলা, কচুরিপানা ইত্যাদি।



উদ্ভিদ জড় কতুর উপর নির্ভরশীল

জীব বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের বিভিন্ন জড় কতুর উপর নির্ভরশীল। কোনো স্থানের সকল জীব ও জড় এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়াই হলো ওই স্থানের **বস্তুসংস্থান**।

২. উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

প্রশ্ন : উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল?



কাজ :

পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

কী করতে হবে :

১. নিচে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

জীব	কীভাবে পরস্পর নির্ভরশীল
উদ্ভিদ	
প্রাণী	

২. কীভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নিচের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে তার একটি তালিকা তৈরি করি।

৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।



সারসংক্ষেপ

পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

প্রাণী

প্রাণী বিভিন্নভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। খাদ্য তৈরির সময় উদ্ভিদের ত্যাগ করা অক্সিজেন প্রাণী শ্বাস গ্রহণের সময় ব্যবহার করে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ যেমন- কাণ্ড, শাখা ও ফলমূল প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ আবার অনেক প্রাণীর আবাসস্থল। বানর, কাঠবিড়ালি, পোকা-মাকড় ইত্যাদি গাছে বাস করে। পাখি গাছের ডালে বাসা বাঁধে। মানুষও তার বাসস্থান তৈরিতে উদ্ভিদ ব্যবহার করে।

উদ্ভিদ

উদ্ভিদ তার খাদ্য তৈরি, বৃদ্ধি, **পরাগায়ন** ও **বীজের বিস্তরণের** জন্য প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ খাদ্য তৈরির জন্য প্রাণীর ত্যাগ করা কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে। পুষ্টি উপাদানের জন্যও উদ্ভিদ প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। প্রাণীর মৃতদেহ পচে প্রাকৃতিক সারে পরিণত হয়। এই সার পুষ্টি হিসেবে ব্যবহার করে উদ্ভিদ বেড়ে ওঠে।



পরাগায়ন

পরাগায়নের ফলে উদ্ভিদের বীজ সৃষ্টি হয়। এই বীজ থেকে আবার নতুন উদ্ভিদ জন্মায়। বিভিন্ন প্রাণী যেমন- পাখি, মৌমাছি ইত্যাদি এই পরাগায়নে সাহায্য করে। মাতৃউদ্ভিদ থেকে বিভিন্ন স্থানে বীজের ছড়িয়ে পড়াই হলো বীজের বিস্তরণ। বীজের বিস্তরণ নতুন নতুন উদ্ভিদ আবাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

এভাবেই পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের উপর নির্ভরশীল।



উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

৩. শক্তি প্রবাহ

বৈচে থাকার জন্য জীবের শক্তি প্রয়োজন। উদ্ভিদ সূর্য থেকে শক্তি পায়। আর প্রাণী শক্তি পায় খাদ্য থেকে।

প্রশ্ন : প্রাণী কীভাবে শক্তির জন্য অন্য জীবের উপর নির্ভরশীল ?



কাজ :

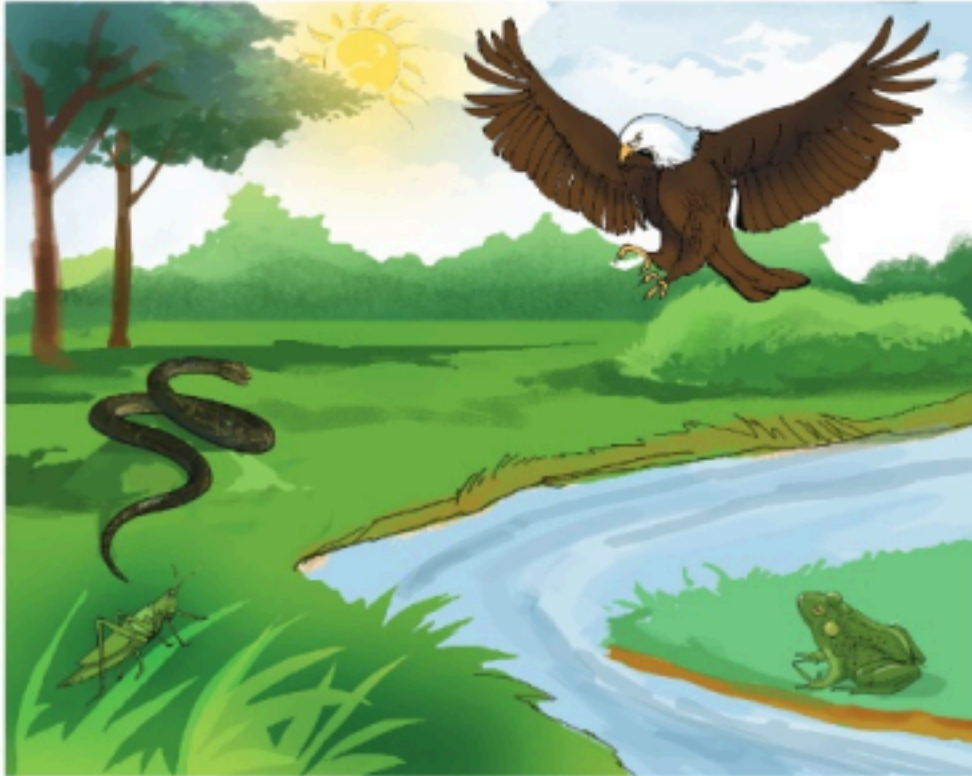
খাদ্য এবং খাদক

কী করতে হবে :

১. নিচে দেখানো ছকের মতো খাতার একটি ছক তৈরি করি।

খাদ্য এবং খাদকের মধ্যে সম্পর্ক			
কে খায় →	কে খায় →	কে খায় →	কে খায় →

২. নিচের ছবিটি দেখি। ছবি দেখে কে কাকে খায় তা ক্রমানুসারে ছকে লিখি।
৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।



সারসংক্ষেপ

খাদ্য শৃঙ্খল

সকল প্রাণীই শক্তির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ সূর্যের আলো ব্যবহার করে নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে। পোকামাকড় উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে। আবার ব্যাঙ পোকামাকড়কে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। একইভাবে সাপ ব্যাঙ খায় এবং ঈগল সাপ খায়। এভাবেই শক্তি উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে প্রবাহিত হয়। বাস্তুসংস্থানে উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে শক্তি প্রবাহের এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়াই হলো **খাদ্য শৃঙ্খল**। সবুজ উদ্ভিদ থেকেই প্রতিটি খাদ্য শৃঙ্খলের শুরু।



খাদ্য জাল

যেকোনো বাস্তুসংস্থানে অনেকগুলো খাদ্য শৃঙ্খল থাকে। বাস্তুসংস্থানের সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী কোনো না কোনো খাদ্য শৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত। যেমন— ঈগল সাপ, ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, ব্যাঙ ও অন্যান্য প্রাণী খেয়ে থাকে। আবার সাপ খরগোশ, ইঁদুর, ব্যাঙ ও অন্যান্য প্রাণী খায়। একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল একত্রিত হয়ে **খাদ্য জাল** তৈরি করে।



অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দিই।

১) শক্তির মূল উৎস কোনটি?

ক. উদ্ভিদ

খ. সূর্য

গ. চাঁদ

ঘ. প্রাণী

২) কোনটির জন্য প্রাণী উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল ?

ক. আলো

খ. পানি

গ. খাদ্য

ঘ. বাতাস

৩) নিচের কোনটি সঠিক খাদ্য শৃঙ্খল ?

ক. ঘাস ফড়িং → ঘাস → সাপ → ব্যাঙ

খ. ব্যাঙ → ঘাস ফড়িং → ঘাস → সাপ

গ. সাপ → ঘাস ফড়িং → ঘাস → ব্যাঙ

ঘ. ঘাস → ঘাস ফড়িং → ব্যাঙ → সাপ

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ১) খাদ্য জাল ও খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে পার্থক্য কী ?
- ২) উদ্ভিদ কীভাবে প্রাণীর উপর নির্ভরশীল ?
- ৩) মানুষ নির্ভর করে এমন তিনটি জড় বস্তুর উদাহরণ দিই।
- ৪) পরাগায়ন কী ?

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

- ১) খাদ্য শৃঙ্খলে কীভাবে সাপ এবং ঈগল একই রকম তা ব্যাখ্যা করি।
- ২) নিচের শব্দগুলো নিয়ে গঠিত খাদ্য শৃঙ্খলের সঠিক ক্রম ব্যাখ্যা করি।
ঈগল, সূর্য, ঘাস, পোকামাকড়, সাপ, ব্যাঙ
- ৩) জীব কীভাবে বায়ুর উপর নির্ভরশীল তা ব্যাখ্যা করি।
- ৪) উদ্ভিদের জন্য বীজের বিস্তরণ কেন গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করি।
- ৫) তোমার ঘরের ভেতরে রাখা গাছটি মারা যাচ্ছে। তোমার বন্ধুরা গাছটিকে জানালার পাশে নিয়ে রাখার পরামর্শ দিল। কেন ?

পরিবেশ দূষণ

বেঁচে থাকার জন্য আমরা পরিবেশকে নানাভাবে ব্যবহার করি। ফলে পরিবেশে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন যখন জীবের জন্য ক্ষতিকর হয়, তখন তাকে আমরা পরিবেশ দূষণ বলি। বিভিন্ন ক্ষতিকর ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবেশে মিশলে **পরিবেশ দূষিত** হয়।

১. আমাদের পরিবেশে দূষণ

প্রশ্ন : কী কী কারণে পরিবেশ দূষিত হয়?



কাজ : আমাদের চারপাশের পরিবেশ দূষণ

কী করতে হবে :

১. খাতায় একটি পর্যবেক্ষণ ফরম তৈরি করি।

পর্যবেক্ষণ ফরম

পর্যবেক্ষণের স্থান :

পর্যবেক্ষণের তারিখ :

চলো প্রাপ্ত দূষণগুলোর ছবি আঁকি

২. শ্রেণিকক্ষের বাইরে আশপাশে বিভিন্ন ধরনের দূষণ খুঁজে বের করি।
৩. পর্যবেক্ষণ ফরমে দূষণগুলোর ছবি আঁকি।
৪. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।



আলোচনা

◆ নিচের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করি।

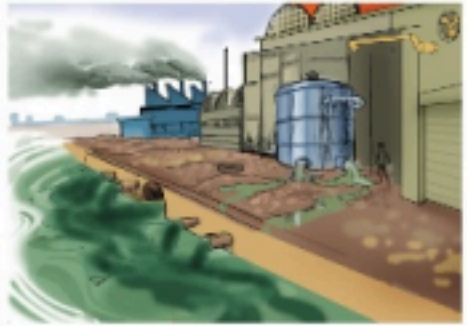
১. আমাদের চারপাশে কী ধরনের দূষণ রয়েছে?
২. দূষণের কারণ কী?
৩. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

সারসংক্ষেপ

বর্তমানে পৃথিবীর অনেক সমস্যার মধ্যে একটি বড় সমস্যা হলো পরিবেশ দূষণ।

পরিবেশ দূষণের উৎস ও কারণ

পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হলো **শিল্পায়ন**। শিল্পকারখানা সচল রাখতে বিভিন্ন ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন— তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এই জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারই দূষণের প্রধান উৎস। জনসংখ্যা বৃদ্ধি দূষণের আরও একটি বড় কারণ। প্রয়োজনীয় খাদ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য মানুষ পরিবেশ ধ্বংস করছে। পরিবেশের বেশির ভাগ দূষণ মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের ফলেই হয়ে থাকে।



পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ দূষণের প্রভাব

দূষণের ফলে মানুষ, জীবজন্তু ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। দূষণের কারণে মানুষ বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যেমন— ক্যান্সার, শ্বাসজনিত রোগ, পানিবাহিত রোগ, ত্বকের রোগ ইত্যাদি। দূষণের ফলে জীবজন্তুর আবাসস্থল নষ্ট হচ্ছে। খাদ্য শৃঙ্খল ধ্বংস হচ্ছে। ফলে অনেক জীব পরিবেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে হিমবাহ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে।



তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে হিমবাহ গলে

২. বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ

বায়ু, পানি, মাটি ও শব্দ দূষণের মাধ্যমেই সাধারণত পরিবেশ দূষিত হয়।

(১) বায়ু দূষণ

বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাস, ধূলিকণা, ধোঁয়া অথবা দুর্গন্ধ বায়ুতে মিশে বায়ু দূষিত করে। যানবাহন ও কলকারখানার ধোঁয়া বায়ু দূষণের প্রধান কারণ। গাছপালা ও ময়লা আবর্জনা পোড়ানোর ফলে সৃষ্টি ধোঁয়ার মাধ্যমেও বায়ু দূষিত হয়। যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা এবং মলমূত্র ত্যাগের ফলে বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়ায়। বায়ু দূষণের ফলে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও এসিড বৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও মানুষ ফুসফুসের ক্যান্সার, শ্বাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।



বায়ু দূষণের কারণ



এসিড বৃষ্টির ফলাফল

(২) পানি দূষণ

পানিতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর পদার্থ মিশ্রিত হয়ে পানি দূষিত হয়। পয়ঃনিষ্কাশন, গৃহস্থালি ও হাসপাতালের বর্জ্য দ্বারা পানি দূষিত হয়। কৃষি জমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পানির সাথে মিশে পানিকে দূষিত করে। কারখানার ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থের মাধ্যমে পানি দূষিত হয়। এছাড়া ময়লা আবর্জনা পানিতে ফেলা, কাপড় ধোয়া ইত্যাদির মাধ্যমেও পানি দূষিত হয়। পানি দূষণের ফলে জলজ প্রাণী মারা যাচ্ছে এবং জলজ খাদ্য শৃঙ্খলে ব্যাঘাত ঘটছে। পানি দূষণের কারণে মানুষ কলেরা বা ডায়রিয়ার মতো পানিবাহিত রোগে এবং বিভিন্ন চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছে।



পানি দূষণের কারণ



পানি দূষণের ফলাফল































































































































